সাফল্য ক্রিকেটের মাঠ ফুটবলের!

নাজমুল হক তপন ও সজল জাহিদ

গত ৮ ফেব্রুয়ারি ৬ষ্ঠ ইস্পাহানি জাতীয় লীগের প্রথম ম্যাচে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে দেখা গেলো ব্যতিক্রমী এক ঘটনা। ম্যাচে ঢাকা বিভাগের মুখোমুখি সিলেট বিভাগ। ম্যাচে সিলেটের ক্রিকেটাররা খেলতে নামলেন কালো ব্যাজ পরে। এ সময় দেশের কোনো বিখ্যাত ক্রিকেটার মারা যাননি। তবে কিসের জন্য ক্রিকেটারদের এই শোক? দেশের ক্রিকেটপ্রেমী মাত্রই জানেন, ক্রিকেটারদের এ কালো ব্যাজ পরার হেতু। কোনো ব্যক্তি বিশেষের জন্য নয়। বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম থেকে ক্রিকেটের উচ্ছেদের প্রতিবাদের অংশ হিসেবে এই মুহূর্তে বাংলাদেশ ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় ভরসার জায়গা সিলেটের ক্রিকেটারদের এ সম্মিলিত শোক ও একই সঙ্গে প্রতিবাদ। সরকারি এক কলমের আঁচড়ে অর্ধশতাব্দীর ঐতিহ্য ক্রিকেট বিশ্বের অন্যতম তীর্থক্ষেত্র বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম থেকে মহাপ্রয়ান ঘটে গেল ক্রিকেটের। গত বছরের শেষ দিকে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম থেকে চিরস্থায়ীভাবে ক্রিকেটকে শুধুমাত্র ফুটবলের জন্য তৈরি শেরেবাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে (মিরপুর স্টেডিয়াম) নিয়ে যাওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শুধু সিদ্ধান্ত নিয়েই বসে থাকেনি সরকার নিয়ন্ত্রনাধীন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)। ইতিমধ্যেই মিরপুর স্টেডিয়ামে শুরু হয়ে গেছে উইকেট তৈরির কাজও। গত ১০ ফেব্রুয়ারি মিরপুর স্টেডিয়ামে উইকেট তৈরির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্তমান বিসিবি সভাপতি আলী আসগর লবি ও বোর্ডের ডেভেলপমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান আরাফাত রহমান। বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম থেকে ক্রিকেটের উচ্ছেদের বিষয়ে আন্তর্জাতিক ক্যাম্পেইনেও শুরু করেছে বর্তমান বাংলাদেশের ক্রিকেট নীতি নির্ধারকেরা। নজর দেয়া যাক গত ৩১ জানুয়ারি বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে ৫ ম্যাচ সিরিজের ৫ম ও শেষ ম্যাচের দিকে। বলা বাহুল্য, ম্যাচটির ভেন্যু ছিল বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম। ম্যাচ চলাকালীন বর্তমান বিশ্বের জনপ্রিয় টিভি ধারাভাষ্যকার রবি শাস্ত্রী বললেন, 'এটাই বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের সর্বশেষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ।' সব মিলিয়ে ঢাকা স্টেডিয়াম থেকে ক্রিকেটকে উচ্ছেদ করার সব আয়োজনই হয়ে গেছে সম্পন্ন।

ঢাকা স্টেডিয়াম (গত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে পরিবর্তিত হয়ে নামকরণ হয়ে যায় বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম) আর বাংলাদেশ ক্রিকেট এই সম্পর্কটা শুধুমাত্র তুলনীয় হতে পারে মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্কের সঙ্গে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার প্রায় দু'দশক আগে শুধু ক্রিকেটের জন্যই নির্মিত হয়েছিল ঢাকা স্টেডিয়াম। একীভূত পাকিস্তানের প্রথম টেস্ট ভেন্যুও ঢাকা স্টেডিয়াম। দেশের মাটিতে পাকিস্তানের অভিষেক টেস্টের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ঢাকা স্টেডিয়াম। ১৯৫৫ সালের ১ জানুয়ারিতে এই ঢাকা মাঠেই দেশের মাটিতে টেস্ট অভিষেক হয় পাকিস্তানের। ভারতের বিপক্ষে ৫ টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্টটি অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা মাঠে। বাকি ৪টি পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন মাঠে। যার শেষটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঐতিহ্যবাহী করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে। যার অর্থ হচ্ছে ঐ ঐতিহ্যে, গরিমায়, কৌলিণ্যে উপমহাদেশের ক্রিকেট ভেন্যুর মধ্যে এক ইডেন গার্ডেনই কেবল তুলনীয় হতে পারে ঢাকা স্টেডিয়ামের সঙ্গে। সরকারি এক সিদ্ধান্তে সেই ঐতিহ্য চিরতরে ধ্বংস করার আয়োজন সম্পন্ন। আর এটা করতে গিয়ে গত এক দশকের বেশি সময় ধরে ঢাকা স্টেডিয়ামের মালিকানা নিয়ে ফুটবল-ক্রিকেট দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়েছে এ দেশের বর্তমান ক্রীড়া নীতি নির্ধারকেরা। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে খুবই চুপিসারে। শুধু ফুটবলের জন্য নির্মিত মিরপুর স্টেডিয়াম ক্রিকেটকে দিয়ে দেয়া এবং ক্রিকেটের ঐতিহ্য ঢাকা স্টেডিয়ামকে চিরস্থায়ীভাবে ফুটবলের জন্য বরাদ্দ দেয়া বিষয়ে যে লিখিত চুক্তি, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞই থেকে গেছে এ দেশের জনগণ। কেননা এই চুক্তি সম্পর্কে কিছুই জানানো হয়নি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে। এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের দেখভালের দায়িত্ব জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের। জনগণের প্রশ্ন, কেনই বা এই উচ্ছেদ আর কেনই বা এটা নিয়ে এতো ঢাক ঢাক গুড় গুড়।

ঢাকা স্টেডিয়াম থেকে ক্রিকেটের উচ্ছেদ, এই উচ্ছেদ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নেয়া সেই অনুযায়ী কার্যক্রম শুরু করা এবং সর্বোপরি চুক্তি নিয়ে নীতি নির্ধারকদের অস্পষ্টতাকে সহজভাবে মেনে নিচ্ছে না এ দেশের ক্রিকেটার ও ক্রিকেটপ্রেমীরা। ক্রিকেটের ঢাকা স্টেডিয়ামকে ক্রিকেটের থাকার জন্য আন্দোলনে নেমেছে অনেক ক্রিকেটপ্রেমীই। প্রায় প্রতিদিনই বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের ২১ নম্বর গেটে এই আন্দোলনকারীদের দেখা যায় ব্যানার , প্ল্যাকার্ড হাতে নীরব প্রতিবাদে অংশ নিতে। গত ৩১ জানুয়ারি জিম্বাবুয়ে-বাংলাদেশ ম্যাচ থেকে ক্রমশ দৃশ্য (প্ল্যাকার্ড ব্যানার হাতে আন্দোলনকারীদের) দেখা যায় প্রায় প্রতিদিনই। ক্রিকেটের মাঠ থেকে ক্রিকেটের উচ্ছেদ বন্ধের জন্য নীরব প্রতিবাদে সরকারি উর্ধ্বতন মহলের কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙছে না বুঝতে পেরে আইনি আশ্রয় নেয়ার কথা ভাবছে আন্দোলনকারীরা, জনস্বার্থবিরোধী মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা।

এই উচ্ছেদের প্রক্রিয়াকে উসকেছে ফুটবল-ক্রিকেট দ্বন্দ্ব

১৯৮৮ সালের উইলস এশিয়া কাপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা স্টেডিয়ামে। তখন থেকেই নতুন করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ফিরে আসে ঢাকা স্টেডিয়ামে। এর পরের ৪ বছর ফুটবল ক্রিকেট পেয়ে যায় আলাদা আলাদা ঠিকানা। ফুটবল চলে যায় মিরপুর স্টেডিয়ামে আর ক্রিকেট থেকে যায় তার আদি ঠিকানা ঢাকা স্টেডিয়ামেই।

সবকিছুই চলছিল ঠিকঠাক মতোই। উইলস এশিয়া কাপের পর থেকে উপমহাদেশ ক্রিকেটের ঢেউ আছড়ে এসে পড়ে বাংলাদেশেও। আবারও ঢাকা স্টেডিয়াম হয়ে ওঠে ক্রিকেটের প্রাণকেন্দ্রে। একদিকে ফুটবলের জনপ্রিয়তা হ্রাস অন্যদিকে ক্রিকেটের প্রতি মানুষের আবেগ। শুরুতে মিরপুর স্টেডিয়ামেও ছিল গ্যালারি ঠাসা দর্শক। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে দেখা দেয় বিপত্তি। ফুটবলমুখো হয় না দর্শক। ফুটবল কর্মকর্তারা এর জন্য দায়ী করে ঢাকা স্টেডিয়াম থেকে ফুটবলের নির্বাসন দেয়াকে।

ঢাকা স্টেডিয়ামে ফুটবলকে ফিরিয়ে আনার দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে ফুটবল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও ক্রীড়াবিদরা। ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে ঢাকা স্টেডিয়ামে ছিল ক্রিকেটের জয় জয়কার। ১৯৭০ ও ১৯৮০-এর দশকে উইলস এশিয়া কাপের আগ পর্যন্ত ঢাকা স্টেডিয়াম মানেই শুধু ফুটবল আর ফুটবল। ১৯৮০-এর দশকে ঢাকা স্টেডিয়াম ছিল ফুটবল-ক্রিকেটের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। কিন্তু ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে এবং বাংলাদেশে ক্রিকেট আন্তর্জাতিক ভিত্তির ওপর দাঁড়ানো শুরু করলে পাল্টে যায় পরিস্থিতি। 'ঢাকা স্টেডিয়াম শুধুই আমাদের' এই দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে ফুটবল সংশ্লিষ্ট ও ক্রিকেট সংশ্লিষ্ট সবাই।

'ক্রিকেটের জন্য আলাদা কমপ্লেক্স দরকার ছিল'

ফজলুর রহমান
প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

ক্রিকেট ও ফুটবলকে স্থায়ীভাবে আলাদা মাঠ দেয়ায় অনেক দিনের সমস্যার সমাধান হয়েছে। আমার বিবেচনায় সিদ্ধান্ত ঠিকই আছে। ক্রিকেটের জন্য যেমন আলাদা একটা কমপ্লেক্স দরকার ছিল, তেমনি ফুটবলের জন্য দরকার ছিল বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামটি। এক টেবিলে সবাই মিলে বসেই সিদ্ধান্তে এসেছে। ক্রিকেট বোর্ড ভালো মনে করেছে বলেই তারা মিরপুরকে বেছে নিয়েছে। আর এর মাধ্যমে ক্রিকেটের কোনো ক্ষতি হবে না বলেই বিশ্বাস করি। এই মাঠের বাইরেও ক্রিকেটকে আলাদা পাঁচটি মাঠ দেয়া আছে। এ সবই করা হয়েছে প্রায়োরিটি ব্যাসিসে। কাগজে-কলমেই এবার সমাধানের পথ তৈরি করা হয়েছে। যাতে ইচ্ছে হলেই যে কেউ যে কোনো কথা বলতে না পারে। আবার এটাও ঠিক যে, দু-চারজন সবসময়ই ভালো কাজেরও বিপক্ষে অবস্থান নেয়। এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই। আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

ফুটবল-ক্রিকেটের এহেন রশি টানাটানির একটা পর্যায়ে ফুটবল-ক্রিকেটের জন্য আলাদা আলাদা ঠিকানা তৈরি হওয়ার একটা বাস্তবতাও তৈরি হয়। ফুটবল-ক্রিকেট এই দ্বন্দ্বকে পুঁজি হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। আর এটা করতে গিয়ে রাজনীতির খুঁটি হিসেবে ব্যবহৃর হয়েছে ফুটবল ও ক্রিকেট এবং একই সঙ্গে ঢাকা স্টেডিয়াম। একটা জায়গায় কিন্তু বেশ মিল আছে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সরকারের। যে দলই ক্ষমতায় এসেছে ঢাকা স্টেডিয়াম থেকে চেষ্টা করেছে ক্রিকেটকে সরিয়ে নেয়ার। ১৯৯৪ সালে তৎকালীন বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল হক বলেছিলেন, 'ঢাকা স্টেডিয়াম ফুটবলের জন্য ছেড়ে দিয়ে ক্রিকেট মিরপুর স্টেডিয়ামে যাওয়াটাই সবদিক থেকে সুবিধা।' আওয়ামী লীগ সরকারের প্রায় পুরো সময়টা জুড়েই জিইয়ে থাকে ফুটবল- ক্রিকেট এই দড়ি টানাটানি। তবে আইসিসিতে বাংলাদেশের চ্যাম্পিয়ন হওয়া এবং সেই সুবাদে বাংলাদেশের ওয়ান ডে ও টেস্ট স্ট্যাটাস প্রাপ্তি সব মিলিয়ে ঢাকা স্টেডিয়ামের মালিকানা নিয়ে অনেক জোরালো অবস্থানে চলে আসে ক্রিকেট। মনে করা যাক আইসিসি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দিনের ঘটনা। ১৯৯৭ সালের আইসিসি চ্যাম্পিয়নশিপের সময়ে ঢাকা স্টেডিয়ামের মালিকানা নিয়ে ফুটবল-ক্রিকেট দ্বন্দ্ব নেয় চরম আকার। আইসিসিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দিন বিক্ষুব্ধ ক্রিকেটপ্রেমীরা ঢুকে পড়ে ঢাকা স্টেডিয়ামে। তারা উপড়ে ফেলে ফুটবলের গোলপোস্টের বার। আবেগ প্রকাশ করতে গিয়ে ফুটবলের কারণে ক্ষতবিক্ষত উইকেটের ওপর গড়াগড়ি করতে থাকে তারা।

দ্বন্দ্ব, বিভেদ মানেই রাজনীতিবিদদের ফায়দা লোটার সুবিধা করে দেয়া। যুগ যুগ ধরে এটাই হয়ে আসছে। ব্যতিক্রম হয়নি ঢাকা স্টেডিয়ামের বেলায়ও। ফুটবল কিংবা ক্রিকেটার যেই হোক না কেন ঢাকা স্টেডিয়াম নিয়ে যে যার মতো করে খাটিয়েছেন রাজনৈতিক প্রভাব। দুই সরকারের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, এনিয়ে এগিয়ে ফুটবল। এনিয়ে সাবেক বিসিবির একজন কর্মকর্তার ভাষ্য, 'আসলে সব সরকারের সময়েই ক্রিকেটারদের চাইতে বেশি ঘনিষ্ঠতা থাকে ফুটবল সংশ্লিষ্টদের। ফুটবল-ক্রিকেটের দ্বন্দ্বের জন্য এটাও কম দায়ী নয়।'

রাজনীতির কারণে সরকারি সিদ্ধান্তের সাফাই গাওয়ার জন্যও লোকের অভাব নেই এদেশে। সাধারণভাবে দেখা যায় ক্রিকেটাররা চায় ঢাকা স্টেডিয়ামকে ক্রিকেটের কেন্দ্র হিসেবে। আর 'ফুটবলাররা দেখতে চায় ফুটবলের কেন্দ্র হিসেবে। কিন্তু এসব ক্রীড়াবিদরাই আবার যখন কর্মকর্তা বনে যাচ্ছেন তখন পাল্টে যাচ্ছে তাদের সুর। স্মরণ করা যাক ২০০১ সালের প্রথম জাতীয় ক্রিকেট লীগের

'জনগণের ট্যাক্সের পয়সা অপচয় হলে অবশ্যই আইনের আশ্রয় নেয়া হবে'

সাবের হোসেন চৌধুরী
সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড

আমার দৃঢ় বিশ্বাস সিদ্ধান্তটা ক্রিকেটের স্বার্থে হয়নি। এ সরকার জানে না, কি পরিশ্রম আর অর্থ খরচ করে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামকে ক্রিকেট উপযোগী করা হয়েছিল। আমি বিশ্বাস করি যে, কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ক্রিকেটকে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম থেকে নির্বাসিত করা হয়নি। তবে বিভিন্ন স্থাপনার নাম পরিবর্তনের দক্ষতা দেখে আবার বিশ্বাসে আঘাত লাগে। আওয়ামী লীগের সময়ের সমস্ত ভালো কাজ বাতিল করে দেবার সিদ্ধান্ত যেন আগেই নিয়ে রেখেছিল এরা। তবে যে কারণেই হোক না কেন, অবশেষে যদি প্রমাণিত হয়ে যে, জনগণের ট্যাক্সের পয়সা অপচয় করা হয়েছে, তবে অবশ্যই আইনের আশ্রয় নেয়া হবে। আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলেই এসব অনিয়মের হিসাব করা হবে। আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি, যে টাকা খরচ করে মিরপুরের শেরেবাংলা স্টেডিয়াম ক্রিকেট উপযোগী করা হচ্ছে তা দিয়ে আরেকটি নতুন স্টেডিয়াম করা যেত। আমাদের সময়ে এমন পরিকল্পনা থেকেই আমরা পাঁচটি বিভাগীয় স্টেডিয়াম তৈরি করেছি। অবধারিতভাবে প্রত্যেকটিই ক্রিকেটের জন্য বরাদ্দ করা হয়। ক্রিকেট আমাদের বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সুতরাং ক্রিকেট অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবে। তবে ফুটবল যাতে হারিয়ে না যায় তার জন্য আমরা কমলাপুরে একটা ফুটবল স্টেডিয়াম করে দিয়েছি। আমাদের পরিশ্রম এবং কাজের ওপরই এখন সরকার ছড়ি ঘোরাচ্ছে। একটা সময় বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে ক্রিকেট-ফুটবল ভাগাভাগি করে খেলা হতো। এ ক্ষেত্রে সবকিছুর আগে দরকার সমন্বয়। সমন্বয়টা ঠিকমতো হলেই কাজ সহজ হয়ে যায়, যেটা আমরা করতে পেরেছিলাম। আরেকটা বিষয় আমাকে খুবই অবাক করেছে। বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল থাকবে এটাই স্বাভাবিক। আমাদের মাওলানা ভাসানী স্টেডিয়াম বা শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে যেমন তাদের দু'জনের ম্যুরাল আছে। শ্রীলঙ্কার প্রেমাদাসা স্টেডিয়াম বা পাকিস্তানের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামেও এই দু'জনের ম্যুরাল শোভাবর্ধন করছে। কিন্তু সরকার বদলের পরপরই জিয়াউর রহমানের ম্যুরাল বসানো হয়েছে বঙ্গবন্ধুর পাশে। খালেদা জিয়ার একটা ছবিও টাঙানো হয়েছে। এদের নির্বুদ্ধিতা দেখে অবাক হই। ইদানীং আবার বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের নামই এরা মুখে আনতে চায় না। কেউ কেউ সংক্ষেপে বলছেন বিএনএস। অনেকে আবার বলছেন ঢাকা স্টেডিয়াম। আমরা জানি, এ সবই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য বলা।

আগের সময়ের কথা। জাতীয় লীগ অনুষ্ঠিত হয় দেশের বিভিন্ন শহরে। ভেন্যুর বাইরে থাকে ঢাকা স্টেডিয়াম। এটাকে ক্রিকেটাররা মনে করে ঢাকা স্টেডিয়াম থেকে ক্রিকেটকে সরিয়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র হিসেবে। প্রতিবাদে রাজপথে নেমে আসে ক্রিকেটাররা। প্রেসক্লাবের সামনে ব্যাট-বল নিয়ে ম্যাচ খেলতে নেমে যান জাতীয় তারকারা। আর এর নেতৃত্বে ছিলেন সাবেক বাংলাদেশের অধিনায়ক বর্তমানে প্রধান নির্বাচক ফারুক আহম্মেদ। সে সময়ের বিপ্লবী ফারুক আহম্মেদ কিন্তু এবারে ক্রিকেটের সম্পূর্ণ উচ্ছেদে টু শব্দটিও করেননি। অথচ মাত্র ৪ বছর আগে ঢাকা মাঠ থেকে ক্রিকেট উচ্ছেদ হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কা থেকে রাজপথে নেতৃত্ব দেন ফারুক আহম্মেদ। কথা প্রসঙ্গে ফারুক আহম্মেদ জানালেন 'তখন ছিলাম ক্রিকেটার আর এখন কর্মকর্তা। সুতরাং...।'

তবে কি বঙ্গবন্ধুর নামটাই?

আওয়ামী লীগ শাসনামলে ঢাকা স্টেডিয়ামের নতুন নামকরণ হয় বঙ্গবন্ধুর নামে। বঙ্গবন্ধুর একটা ম্যুরাল চিত্রও শোভা পাচ্ছে প্যাভিলিয়ান এন্ডে। ঐ সময় থেকেই বেশি বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা হতো স্টেডিয়ামে। স্বাভাবিকভাবেই বেশি বেশি উচ্চারিত হয় বঙ্গবন্ধুর নাম। অনেকেই মনে করেন বঙ্গবন্ধুর নামের কারণেই বর্তমান সরকার দ্রুত ক্রিকেটকে সরিয়ে ফেলতে চায় ঢাকা স্টেডিয়াম থেকে। এই ধারণার পেছনে বেশ কিছু যুক্তিও খুঁজে পাওয়া যায়। ঢাকার ৩টি মাঠ বাংলাদেশের ৩ জন বিখ্যাত রাজনীতিবিদদের নামে। যেমন মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়াম, শেরে বাংলা একেএম ফজলুল হক স্টেডিয়াম (মিরপুর স্টেডিয়াম) আর বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম। এই তিন স্টেডিয়ামে আছে এই তিন বিশিষ্ট ব্যক্তির ম্যুরাল চিত্র। আন্তর্জাতিক ম্যাচ তেমন অনুষ্ঠিত হয় না হকি কিংবা মিরপুর স্টেডিয়ামে। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ম্যাচ মানেই ক্রিকেট। আর সেটা হয় বঙ্গবন্ধু মাঠেই। মজাটা হচ্ছে, ঢাকা স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল চিত্রের পাশাপাশি আছে মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ম্যুরাল চিত্রও। আছে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছবিও। কিন্তু বাকি দুই স্টেডিয়ামে খালেদা কিংবা জিয়াউর রহমান কারোরই ম্যুরাল চিত্র বা কোন ছবি নেই। তাহলে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে কেন খালেদা জিয়া ও জিয়াউর রহমানের প্রতিকৃতির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলো? এমন প্রশ্ন অনেকেরই। শুধু এখানেই শেষ নয়।

ঢাকা স্টেডিয়ামে এখন ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হয় ১, ২ ও ৩ নম্বর উইকেটে। ৪ ও ৫ নম্বর উইকেটে ম্যাচ হতে দেখা যায় না এখন। ৪ ও ৫ নম্বর উইকেটে খেলা হলে টিভি পর্দায় দৃশ্যমান হয়ে ওঠে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি। আর ১, ২ ও ৩ নম্বর উইকেটে ম্যাচ হলে বঙ্গবন্ধুর ছবি টিভি পর্দায় দেখা যায় না। সে ক্ষেত্রে টিভি পর্দায় ভেসে ওঠে খালেদা জিয়া ও জিয়াউর রহমানের প্রতিকৃতি। এসব কারণেই ১, ২ ও ৩ নম্বর উইকেটে ম্যাচ হয় বলে মনে করেন অনেকেই। ঢাকা স্টেডিয়ামে ক্রিকেট থাকা মানেই বেশি বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ। টিভিতে সম্প্রচার আর বারবার বঙ্গবন্ধুর নাম আনা। বর্তমান সরকারের কাছে যা মোটেও কাঙ্ক্ষিত নয়। এটার সমর্থন মেলে যখন দেখা যায়, কমলাপুর স্টেডিয়ামের নাম শহীদ মোস্তফা কামাল না হয়ে, হয় শুধু শহীদ মোস্তফা স্টেডিয়াম। বঙ্গবন্ধু তনয় কামালের নামের কারণে কাঁটছাট হয়ে যায় বীর শ্রেষ্ঠ শহীদ মোস্তফা কামালের নামও।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে দে মা লুটেপুটে খাই

বাংলায় একটা প্রবাদ আছে 'ছড়িয়ে ছিটিয়ে দে মা লুটেপুটে খাই।' ভাঙা গড়া নির্মাণ মানেই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। ১৯৯৭ সালের ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাপ থেকে এখন পর্যন্ত ঢাকা স্টেডিয়ামের আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে খরচ হয়েছে আনুমানিক ৩০-৩৫ কোটি টাকা। এই অবকাঠামোগত উন্নয়নের মধ্যে উল্লেখযোগ্য

'প্রচুর টাকা বেহাত করার জন্যই এমন সিদ্ধান্ত'

দেওয়ান আরেফিন টুটুল

সাবেক পরিচালক, ক্রিকেট বোর্ড

এটা বোর্ডের একার সিদ্ধান্ত নয়, সরকারও এই সিদ্ধান্তের অংশ। তবে বোর্ড যে এই যুক্তিতে অংশ নিয়েছে সেটাই তো বৈধতা পায় না। বোর্ডে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হলে তা নির্বাচিতদের মাধ্যমে নিতে হবে। ক্রিকেট বোর্ডে তো বর্তমানে নির্বাচিত কোনো প্রতিনিধি নেই। আর ক্রিকেট বা ফুটবলকে স্থায়ীভাবে আলাদা আলাদা মাঠ দেবার ক্ষেত্রে যে চুক্তি করা হয়েছে সেটাও টাকা খরচ করার জন্যই করা হয়েছে বলেই আমি মনে করি। কারণ টাকা খরচ করতে পারলেই তা বেহাত করার সুযোগ তৈরি হয়। মিরপুরের শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে অবকাঠামোগত উন্নয়নের নামে প্রচুর টাকা যেমন বেহাত হবে, তেমনি দেখা যাবে যিনি হয়তো কন্ট্রাক্টটি নেবেন তিনিই হয়তো বিল পাস করে দেবেন।

'বোর্ডের জন্য সিদ্ধান্তটা বুমেরাং হতে পারে'

গাজী আশরাফ লিপু

জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও ম্যানেজার

একজন সাবেক ক্রিকেটার হিসেবে আমি কখনো চাইবো না ক্রিকেটটা বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম ছেড়ে মিরপুর চলে যাক। শেরেবাংলা স্টেডিয়াম যতই ক্রিকেট উপযোগী করা হোক না কেন সমস্যা থেকেই যাবে। অবকাঠামো হয়তো চাপ দিয়ে তৈরি করে নেয়া গেল। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে কোনোভাবেই ভালো উইকেট তৈরি করা যাবে না। একটা ভালো উইকেটে বানাতে ন্যূনতম দুই-তিন বছর সময় লাগে। বাংলাদশের পরবর্তী হোম সিরিজ আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। দু'মাস পরেই আসবে অস্ট্রেলিয়া। চ্যাম্পিয়ন এই দল দুটো কি আনপ্রিপিয়ার্ড উইকেটে খেলতে রাজি হবে? এরই মধ্যে চট্টগ্রামের এমএ আজিজ স্টেডিয়ামও ছেড়ে দিতে হবে ক্রিকেটকে। দুটো নতুন মাঠ নতুন উইকেট ক্রিকেটের জন্য বুমেরাং হয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশ ক্রিকেটের অভিভাবক ক্রিকেট বোর্ড। তাদেরই এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে ক্রিকেটকে তারা কোন দিকে নিয়ে যাবে।

'ক্রিকেটের ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ যেখানেই হোক মাঠে দর্শক যাবেই'

আনোয়ারুল হক হেলাল

সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন

আলাদা মাঠ বেছে নেয়ার এই সিদ্ধান্ত কাউকে চাপিয়ে দেয়া হয়নি। আলোচনার মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামটা ফুটবল পাওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্য আমাদের কিছু যুক্তিও ছিল। তাই এ মাঠকে ক্রিকেটের মাঠ বলা হলেও এটাই আমাদের ফুটবলের কেন্দ্রবিন্দু। ঐতিহাসিকভাবেও এটা সত্যি। ফুটবলকে জাগানোর জন্যেও এখানে ফুটবল খেলা ফিরিয়ে আনা উচিত। তাছাড়া স্টেডিয়ামটা এমন একটা জায়গায় যে, অফিস সেরে যে কেউই ফুটবল ম্যাচটা দেখে নিতে পারবে। মাত্র দেড় ঘন্টার খেলা দেখতে দুই দুই চার ঘন্টার ট্রাফিক জ্যাম পেরিয়ে কেউ মিরপুর যেতে চায় না। কিন্তু ক্রিকেট তো সারা দিনের খেলা। যারা ক্রিকেট খেলা দেখতে যায় তারা সারা দিনের প্রস্তুতি নিয়েই যায়। আর দর্শকের সংখ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে গেলে বলতে হবে ফুটবলের দর্শক সব ঘরোয়া আসরের দর্শক। আর ক্রিকেটের দর্শকরা সব ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচের দর্শক। ক্রিকেটের ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ যেখানেই হোক দর্শক চলে আসবে। এখানে মাঠের অবস্থান কোনো ব্যাপার নয়। তবে কেউ যদি অবকাঠামো নিয়ে কথা বলতে চান তবে আমি বলবো, সেটা খুবই সামান্য একটা ব্যাপার। আর মাঠ ভাগাভাগি করে ব্যবহার করার কথা বললে আমি বলবো, সেটা আমাদের কারো জন্যই আর্থিক বিবেচনায় সুবিধার হবে না।

হলো ইলেকট্রনিক স্কোরবোর্ড, ক্রিকেট উপযোগী ফ্লাড লাইট, টিভি সম্প্রচার কেন্দ্র, বিশাল ক্যামেরা প্লাটফর্ম, প্রেস বক্স, আধুনিক মিডিয়া সেন্টার, হসপিটালিটি বক্সসমূহ, আন্তর্জাতিক গ্যালারি ও আধুনিক ড্রেসিংরুম ইত্যাদি। এসব কিছুই করা হয়েছে দেশের সেরা আন্তর্জাতিক ভেন্যুকে সামনে রেখেই। এখন ক্রিকেটের উচ্ছেদ মানে ৩০-৩৫ কোটি টাকার শ্রেফ শ্রাদ্ধ। আগেই বলা হয়েছে, ঢাকা স্টেডিয়াম তৈরি হয়েছিল শুধু ক্রিকেটের জন্যই। মাঠের গঠনও সেভাবেই। নামী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ভেন্যুগুলো যেভাবে তৈরি ঢাকা স্টেডিয়ামও তৈরি সেভাবে। আর সে কারণে মিডিয়া সেন্টার, টিভি সম্প্রচার কেন্দ্র সবকিছুই মাঠের একপ্রান্তে। যাতে করে বোলার-ব্যাটসম্যানদের মুভমেন্ট ভালোভাবে পরখ করা যায়। আর আদর্শ ফুটবল ভেন্যুর ক্ষেত্রে দেখা যায়, মিডিয়া সেন্টার থাকে মাঝামাঝি অঞ্চলে। দর্শক গ্যালারির ক্ষেত্রেও ক্রিকেটের সঙ্গে ফুটবল মাঠের পার্থক্যও মৌলিক। ঢাকা স্টেডিয়াম আর মিরপুর স্টেডিয়ামের দিকে তাকালেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে পার্থক্যটি। ঢাকা স্টেডিয়াম শুধু ক্রিকেটের জন্য আর মিরপুর স্টেডিয়াম শুধু ফুটবলের জন্যই। এখন মিরপুর স্টেডিয়ামকে ফুটবল থেকে ক্রিকেট উপযোগী করা মানেই আরো ৩৫-৪০ কোটি টাকার শ্রাদ্ধ হওয়া। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা টাকার অঙ্কটা আরো বাড়বে। একটা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ভেন্যু তৈরি করতে গেলে কমপক্ষে ৫ থেকে ৭টি উইকেট তৈরি করতে হবে। একটা উইকেট থেকে মাঠের দূরত্ব হতে হবে কমপক্ষে ৬০ গজ। মিরপুর স্টেডিয়ামে এটা করতে গেলে স্টেডিয়ামের একটা অংশকে ভাঙতেই হবে। আর এটা করতে যাওয়া মানে খরচের পরিমাণ আরো বেড়ে যাওয়া। আর এতো কিছুর যজ্ঞ মানেই প্রচুর টাকার কাজ হওয়া। খুব স্বাভাবিক কারণেই এর দায়িত্ব পাবে সরকার ঘনিষ্ঠ ক্রীড়ানীতি নির্ধারকেরাই। টাকা কামানোর সহজ সুযোগ হাতছাড়া করবে কেন কর্মকর্তারা? যত কাজ তত টাকা। আর সে কারণেই উৎসাহটা বেশি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এনএসসির সাবেক এক কর্মকর্তা বলেন, 'ঢাকা স্টেডিয়াম থেকে ক্রিকেটকে সরানোর ফন্দি আর কিছুই নয়- শুধু টাকা কামানো।'

'বোর্ডের কোনো সিদ্ধান্ত পছন্দ না হলেও আন্দোলনে নামা সম্ভব নয়'

ফারুক আহমেদ

জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক, বর্তমান প্রধান নির্বাচক

আমি তো এখন বোর্ডের হয়ে কাজ করি। বোর্ডের কোনো সিদ্ধান্ত পছন্দ না হলেও আমার পক্ষে আন্দোলনে নামা সম্ভব নয়। হ্যাঁ এটা ঠিক যে, বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম ক্রিকেট না পাওয়ায় আমি কষ্ট পেয়েছি। তবে মিরপুরে যাওয়াতে আমাদের কতখানি লাভ বা ক্ষতি হলো তা এখনই বলা সম্ভব নয়। বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম ক্রিকেটেরই মাঠ। এর সঙ্গে দেশের ক্রিকেট ঐতিহ্যও জড়িত। কিন্তু নতুন ঐতিহ্যের জন্মও তো হতে পারে।

'বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামেই ক্রিকেট রাখতে হবে এটা আমাদের প্রাণের দাবি'

মিনহাজুল আবেদীন নান্নু

জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক

বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম সারা বিশ্বে পরিচিত হয়ে গেছে। ক্রিকেটের বদান্যতায়ই সেটা হয়েছে। তাই টেস্ট ভেন্যু হিসেবে এটাকে রাখতেই হবে। এটা আমাদের প্রাণের দাবি। তবে সরকার যেহেতু সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছে তাই এই সিদ্ধান্ত উল্টে দেয়াও সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে আগের মতো, ক্রিকেট ফুটবলের মধ্যে মাঠটা ভাগাভাগি করে নিলেই হয়। আগে যেমন নিয়ম ছিল অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত এই মাঠটা পেত ক্রিকেট। এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পেত ফুটবল। এই নিয়মটা ফিরিয়ে আনলেও হয়। আবার বিকল্প চিন্তা হিসেবে শুধু আন্তর্জাতিক ম্যাচ বা টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্যই মাঠটা ব্যবহার করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে ঢাকার অন্যান্য মাঠে ঘরোয়া প্রতিযোগিতার আসর বসানো যেতে পারে।

প্রশ্নটা ঐতিহ্য রক্ষার

বাংলাদেশ ক্রিকেট আর ঢাকা স্টেডিয়াম এক অভিন্ন সত্তা। ১৯৭৭-৭৮ মৌসুমে বাংলাদেশ আইসিসির সহযোগী সদস্য পদ লাভ করেছিল এই ঢাকা মাঠেই এমসিসির বিপক্ষে খেলে। বাংলাদেশের টেস্ট স্ট্যাটাস পাওয়ার অন্যতম প্রভাবক এই ঢাকা স্টেডিয়াম। ঢাকা স্টেডিয়ামের দর্শকদের ক্রিকেটপ্রিয়তা বাংলাদেশের টেস্ট স্ট্যাটাস পাওয়াটাকে সহজ করে দেয়। বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট খেলে এই মাঠেই। বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট সিরিজ ও ওয়ানডে সিরিজের জয়ের সঙ্গে চিরস্থায়ীভাবে লেখা হয়ে গেছে ঢাকা স্টেডিয়ামের নাম।

শুধু বাংলাদেশ নয় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আঙ্গিনায়ও ঢাকা স্টেডিয়ামের নাম উচ্চারিত হয় লর্ডস, মেলবোর্ন ও ইডেনের সঙ্গেই। বিশ্ব ক্রিকেটের প্রেস্টিজিয়াস আয়োজনের দিক থেকে অনেক নামিদামী ভেন্যু থেকেও এগিয়ে ঢাকা স্টেডিয়ামের নাম। বিশ্বকাপের পরই ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্ট নকআউট বিশ্বকাপ। যা মিনি বিশ্বকাপ নামেই বেশি পরিচিত। এই নক আউট বিশ্বকাপের প্রথম আসর বসেছিল এই ঢাকা স্টেডিয়ামেই। ক্রিকেটে নিরপেক্ষ টেস্ট ভেন্যুর ধারণার সঙ্গে এখন অভ্যস্ত ক্রিকেটপ্রেমীরা। আর এই নিরপেক্ষ ভেন্যুতে প্রথম টেস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে এই ঢাকা মাঠেই। ১৯৯৯ সালে এশিয়ান টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল হয়েছিল ঢাকা স্টেডিয়ামে। ফাইনালে অংশ নিয়েছে বিশ্ব ক্রিকেটের দুই প্রতিভূ শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান।

বিশ্বসেরা ক্রিকেটারদের মধ্যে ঢাকা মাঠে কারা খেলেছেন সেই হিসাব না কষে কারা খেলেননি সেই হিসাবে কষাটা অনেক সহজ। স্যার ডন ব্র্যাডম্যান ঢাকা মাঠে খেলেননি। কেননা তিনি অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ইংল্যান্ডের বাইরে খেলেননি। স্যার ডন বাদে প্রায় সব বিখ্যাত ক্রিকেটাররাই খেলেছেন ঢাকা মাঠে। পাকিস্তানের কিংবদন্তি হানিফ মোহাম্মদ, ফজল মাহমুদ, ইমরান খান, জাভেদ মিয়াদাদ থেকে শুরু করে হালের ইনজামাম উল হক ও শোয়েব আখতার। এ সময়ের শচীন, সৌরভ, দ্রাবিড় তো বটেই ঢাকা মাঠে খেলে গেছেন কপিল দেব, আজহার উদ্দিন কিংবা আরও আগের গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথরা। নিউজিল্যান্ডের গ্রেন টার্নার কিংবা মারকুটে ব্যাটিংয়ের আদর্শ চরিত্র বার্ট ম্যাটক্লিকের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে ঢাকা স্টেডিয়ামের নাম। ক্রিকেটের গর্ব অস্ট্রেলিয়ার রিচি বেনো কিংবা নিল হার্ভেও সৌরভ ছড়িয়েছেন ঢাকা মাঠে। ক্রিকেট ইতিহাসের সেরা অলরাউন্ডার স্যার গ্যারফিল্ড সোবার্সকে দেখেছেন ঢাকার দর্শকরা। এখানে খেলে গেছেন ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ওয়েসলি হল, রোহান কানহাই এবং হালের ব্রায়ান লারা পর্যন্ত। গত দুই দশক ধরে যাদেরকে মাথায় তুলে নাড়ছে ক্রিকেট বিশ্ব, তাদের সবাই বারবার খেলেছেন বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে।

ঢাকা স্টেডিয়াম থেকে ক্রিকেটের উচ্ছেদে লাভবান তিনটি চক্র। একদল চায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করতে। অন্য দলের ধান্দা মওকা বুঝে টাকা কামানো। আরেক দল চায় ফুটবল-ক্রিকেট পুরনো দ্বন্দ্ব থেকে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে। বাংলাদেশ ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথাব্যথা নেই কারোরই। অথচ বাংলাদেশ ক্রিকেট অতিক্রম করছে চরম ক্রান্তিকাল। বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ের ব্যাপারে খুবই কঠোর মনোভাব এখন আইসিসির। বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের টেস্ট খেলার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে আইসিসি। বাংলাদেশের টেস্ট ক্রিকেট এখন হুমকির মুখে। এ অবস্থায় ঢাকা স্টেডিয়াম থেকে ক্রিকেট সরে গেলে বড় ধরনের খেসারত দিতে হতে পারে বাংলাদেশকে। বাংলাদেশের সাবেক ক্রিকেটাররাও বিষয়টা নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং শঙ্কিত। এ বছরই বাংলাদেশ সফরে আসার কথা শ্রীলঙ্কা ও অস্ট্রেলিয়ার।

বাংলা ব্রাডম্যান!

হাবিবুল বাশারের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট ও ওয়ানডে সিরিজ জয় পেল। টেস্ট ক্রিকেট যিনি এখনো দলের প্রধান ব্যাটিং ভরসা। সম্প্রতি ক্রিকেটের বাইবেল বলে খ্যাত উইজডনে বাংলাদেশ দলের এই কান্ডারিকে নিয়ে 'দ্য বাংলা ব্রাডম্যান' শিরোনামে একটি লেখা ছাপা হয়েছে।
লেখাটি সংক্ষিপ্তরূপে ভাষান্তর করেছেন **ওমর নাসিফ**

৩২ বছর বয়সে তিনি খেলেছেন ৩১টি টেস্ট। অতিক্রম করেছেন ২০০০ রানের ল্যান্ডমার্ক, সেঞ্চুরি করেছেন ৩টি, রান অ্যাভারেজ প্রায় ৩৫। সত্যিই বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসে এটি ব্রাডম্যানীয় কেরিয়ার। যেখানে টেস্ট ক্রিকেটে ব্যাটসম্যানরা প্রতি ইনিংসে গড়ে ২০ রান করতে পারছেন না। যেভাবে অস্ট্রেলিয়ান 'গ্রেটেস্ট অফ দ্য গ্রেট' ডন ব্রাডম্যানের টেস্টে গড় ছিল ৯৯। তখন তার দলের অন্যান্যদের গড় ছিল ৪০-এর কোঠায়।

শুধু ব্যাটিংয়ে নেতৃত্ব দেয়া নয়, বাশারের ওপর রয়েছে বাংলাদেশ দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব। তিনি এ দায়িত্ব সঠিকভাবেই পালন করছেন। সঠিকভাবে বলছি এ কারণে যে, পরিসংখ্যানে তিনি বাংলাদেশের সফলতম অধিনায়ক। তিনি ২০০৪ সালের ২৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হন। এই বছর ২৪ জানুয়ারি তার অধিনায়কত্বের একটি বছর পূর্ণ হয়। এই একটি বছর তার জন্য কেটেছে রোমাঞ্চকর।

বাশার '৯৫ সালে জাতীয় দলে অভিষেক হলেও নিয়মিত আছেন ২০০০ সাল থেকে। বাশার এর আগে ঠিক সেভাবে ক্যাপ্টেন্সি করেননি। ক্লাব টিমেরও না। শুধু জাতীয় লীগে বিমানের ক্যাপ্টেন্সি করেছিলেন, আরেকবার 'এ' দলের। তাই অধিনায়কত্বটাকে তিনি গ্রহণ করেছেন চ্যালেঞ্জ হিসেবে। আর এ চ্যালেঞ্জে তিনি জয়ী হয়েছেন এ কথা বলা যায়। অধিনায়ক হওয়ার আগে তার চিন্তাধারা ছিল পুরোপুরি ব্যাটিং নিয়ে। অধিনায়ক হওয়ার পর দলের পুরো ১১ জনকে নিয়েই তার চিন্তা। অধিনায়কত্বের চাপ তিনি ভালোভাবে সামাল দিয়েছেন। পাশাপাশি ব্যাটিংয়ের ধারাটাও রক্ষা করেছেন। অনেকে অধিনায়কত্বের পাশাপাশি ব্যাটিংয়ে সমান তাল রাখতে পারেন না। ভারতের ব্যাটিং জিনিয়াস টেন্ডুলকার তো অধিনায়ক হওয়ার পর ব্যাটিংয়ে ছিলেন ফ্লপ।

টেস্টের তুলনায় ওয়ানডেতে বাশারের ব্যাটিং ততটা ভালো নয়। তার প্রিয় শট হচ্ছে হুক ও পুল। আবার আউটও হন সাধারণ এসব শট খেলে। কিন্তু স্কোয়ার কাট ও অনসাইডে বাশার ততটা পারদর্শী নন।

২০০৪ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর তার জন্য স্মরণীয় ঘটনা। দুই টেস্টে তার রানের গড় ছিল প্রায় ৬০। সে সমফরের সেন্ট লুসিয়ায় শতবলে করা শতরানটি তার কেরিয়ারের সেরা ইনিংস বলে বাশার নিজেও মনে করেন। উইকেটের চারপাশে ইচ্ছেমতো শট খেলতে পেরেছিলেন। তার মতে, 'সেটা আমার কেরিয়ারের সেরা ইনিংস, কারণ আমি ঠিক যেভাবে খেলতে চেয়েছিলাম ঠিক সেভাবেই খেলতে পেরেছি।' তার কাছে সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্ত ছিল তখন, যখন তিনি বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসে সর্বপ্রথম ইনিংস ঘোষণা দিলেন। সেদিন সেন্ট লুসিয়ার ইতিহাস রচিত হয়। হয় তিনটি শতরান, অপর দুটি রফিক ও মাসুদের।'

বালাদেশের ক্রিকেট আরো ডেভেলপ করার ব্যাপারে বাশারের মত হলো, 'আমাদের দেশে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা হয়। সীমিত ওভারের টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। ঘরোয়া ক্রিকেটের অবকাঠামো তেমন খারাপ নয় কিন্তু আমরা এটার সঠিক মূল্য দিতে পারছি না। আমাদের ক্রিকেটকে এগিয়ে নেয়ার জন্য একটি শক্তিশালী 'এ' দল প্রয়োজন। এ ব্যাপারে পাকিস্তান ও ভারতের মতো দল সাহায্য করতে পারে। তারা 'এ' দল নিয়ে ঘরোয়া টুর্নামেন্টের আয়োজন করতে পারে। এটা হলে আমাদের ক্রিকেটাররা অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারবে এবং তারা মানসিকভাবে দৃঢ় হবে। আমাদেরকে নতুন প্রতিভার জন্য অনূর্ধ্ব-১৯ দলের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে কিন্তু টেস্ট ক্রিকেটে অংশগ্রহণের জন্য আরো কিছুটা ম্যাচিওরিটি প্রয়োজন।

অন্যান্য ক্রিকেটারের মতো বাশারকেও প্রায় সমালোচনা শুনতে হয়। তার পারফরম্যান্স ভালো হলে সকলেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন। কিন্তু ভালো না খেললে কেউ সান্ত্বনা দেয় না, এ ব্যাপারটি বাশারের কাছে খুবই অপ্রিয়। তার প্রিয় অধিনায়ক স্টিফেন ফ্লেমিং। সে মাঠে খুবই চুপচাপ থাকে, যেটা পছন্দ বাশারের। বাশার খুবই মৃদুভাষী, শান্তশিষ্ট ক্রিকেটার। তিনি মাঠে তেমন জোর দিয়ে কাউকে কোনো কিছু কমান্ড করেন না।

অভিষেক টেস্টের ২ ইনিংসে তার রান ছিল ৭৫ ও ৩০। সম্প্রতি জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ওয়ানডেগুলোতে তিনি ভালো ব্যাটিং করেছেন। টেস্ট ক্রিকেটে তার জন্য ব্যক্তিগত সফলতা রয়েছে। বাশার তার কেরিয়ার শেষে ব্যাটিং অ্যাভারেজ কমপক্ষে চল্লিশ আশা করেন।

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সর্বপ্রথম টেস্ট ও ওয়ানডে সিরিজ জয় করে তিনি ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রইলেন শুধু তাই নয়, যতদিন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের ক্রিকেট থাকবে ততদিন তার নাম শ্রদ্ধাভরে উচ্চারিত হবে সবার মুখে মুখে।

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজ জয়ের পর তার ওপর প্রত্যাশা বেড়ে গেছে অনেক গুণ। সামনে ইংল্যান্ড সফর তার জন্য হবে কঠিন পরীক্ষা। ব্যক্তিগত ও দলীয় সাফল্যই ভালো ফলাফল এনে দিতে পারে। সবাই আশা করছেন যে, ভালো একটা ফাইট দেবে বাশারের দল। হয়তো বাশারের হাত ধরে বাংলাদেশের ক্রিকেট উঠে যাবে অন্যরকম উচ্চতায়।

নতুন ভেন্যুতে অপ্রস্তুত উইকেটে শ্রীলঙ্কা ও অস্ট্রেলিয়া টেস্ট খেলতে আদৌ রাজি হবে কি না, এ বিষয়টা পুরোপুরি ভুলে বসে আছেন আমাদের ক্রিকেট নীতি-নির্ধারকেরা। একটা টেস্ট উপযোগী উইকেট তৈরি করতে ২ থেকে ৩ বছর লেগে যায়। অথচ আর মাত্র ক'দিন বাদেই শ্রীলঙ্কা ও অস্ট্রেলিয়ার আসার কথা। উপমহাদেশের বিধায় শ্রীলঙ্কা এ সফরে হয়তো রাজি হতে পারে। কিন্তু ক্রিকেট বিশ্বের একক পরাশক্তি অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে আশঙ্কাটা থেকেই যায়। এর সঙ্গে যদি যোগ হয় ক্রিকেটপ্রেমীদের 'মাঠ বাঁচাও' আন্দোলন-সংগ্রাম (যার লক্ষণ ইতিমধ্যেই প্রতিভাত), তাহলে পরিস্থিতি মোড় নেবে আরো খারাপের দিকে। আদর্শ টেস্ট ভেন্যু নেই- এই অভিযোগে কোন বিদেশী দল যদি বাংলাদেশ সফর বাতিল করে, এর দায়-দায়িত্ব তখন কে নেবে? কোনো বিদেশী দলের টেস্ট সফর বাতিল মানে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতার যে তলানিটুকু এখনো অবশিষ্ট আছে, সেটুকুও শেষ হয়ে যাওয়া। উচ্ছেদকারীরা কি এসব ভেবেছে? তারা না ভাবলেও এসব ভাবাচ্ছে এ দেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের। আর যতই ভাবছে ততই আতঙ্কিত হয়ে উঠছে সবাই।